অধ্যায়: ৭

নির্যাতন

১৯৭১ সালে হত্যা, ধর্ষণ, ঘরবাড়িতে আগুন দেওয়া বা মারধরই কেবল নির্যাতন ছিল না—এর বাইরেও নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হয় গ্রামের মানুষ। দেশ দখলে রাখতে পাকিস্তানিদের একটি কৌশল হিসেবে নির্যাতনের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। এই নির্যাতনের মূল উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানকে বাংলাদেশে টিকিয়ে রাখা।

একটি জনগোষ্ঠীকে কব্জায় রাখতে যত লোকবল প্রয়োজন সেটা পাকিস্তানি সরকার বা আর্মির ছিল না। এই ঘাটতি মেটাতে তারা পিস (শান্তি) কমিটি ও রাজাকার বাহিনী সৃষ্টি করে। শান্তি কমিটির সদস্যরা ছিল গ্রামের প্রভাবশালী গোষ্ঠী। এদের অনেকেই ছিল মুসলিম লীগের সদস্য, যারা ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের কাছে পরাজিত হয়।

রাজাকারদের প্রায় সবাই ছিল নিম্নবিত্ত। তারা সম্পদ লুট ও বিভিন্ন সুবিধা পাওয়ার আশায় এই বাহিনীতে যোগ দেয়। এখানে স্মরণ রাখা দরকার, বিত্তহীন সমাজের ক্ষুদ্র একটি অংশ রাজাকারে যোগ দেয়, যাদের মধ্যে দুর্বৃত্তসুলভ আচরণ লক্ষ করা যায়।

পাকিস্তানিরা বাংলাদেশে যে গণহত্যা চালায় তাতে পিস কমিটি ও রাজাকারদের ভূমিকা হয়ে ওঠে গণহত্যাকারী বা তার পক্ষের শক্তি হিসেবে। রাজাকার ও পিস কমিটির সদস্যরা পাকিস্তানি আর্মির সঙ্গে হত্যা-নির্যাতনে অংশ নিয়েছে এবং নিজেরাও লুটতরাজ ও হত্যা-নির্যাতন চালিয়েছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রামের মানুষকে সহায়তা করেছে এই রাজাকার ও পিস কমিটির সদস্যরা। এটি প্রধানত ঘটেছে গ্রামীণ রাজনীতি বা সম্পর্কের কারণে।

হত্যা, ধর্ষণ, বেঁধে রাখা, লুটপাট, বাড়িতে আগুন দেওয়া ইত্যাদিকে সরাসরি নির্যাতন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। একই সঙ্গে এসব নির্যাতনের পরোক্ষ প্রভাব পড়ে গ্রামের মানুষের প্রতিদিনের জীবনে। এই প্রভাব ছিল দীর্ঘস্থায়ী। এটি পরোক্ষ কিন্তু একইভাবে ধ্বংসাত্মক।

হিন্দু জনগোষ্ঠী এই নির্যাতন থেকে বাঁচতে ভারতে পালিয়ে যায়। কিন্তু ভারতে যাওয়ার পথে তারা খাওয়ার কষ্ট, সম্পদ হারানোর কষ্ট সবই ভোগ করে।

গ্রামের ভিতরে অবস্থানকারী পিস কমিটির সদস্যরা তাদের অনুগত রাজাকারদের মাধ্যমে নির্যাতন পরিচালনা করে। এই স্থানীয় সহায়করা বিভিন্নভাবে

CamScanner

পাকিস্তানি আর্মিকে নির্যাতনে সহায়তা করে। এর পাশাপাশি ছিল ব্যক্তিগত গ্রামীণ শত্রুতা ও স্বার্থ উদ্ধার। সম্পত্তি দখল করার জন্যও নির্যাতনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে অনেকে। এই কাজটি প্রধানত করেছে গ্রামের প্রভাবশালী মানুষ। এমন তথ্য পাওয়া গেছে একাধিক স্থানে। সাধারণত তারা পাকিস্তানি আর্মিকে খবর দিয়ে নিয়ে গেছে এবং পরবর্তী সময়ে হত্যা, নির্যাতন করে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করেছে।

***

শেরপুর গ্রামের খাদিজা জানান, নির্যাতনের ভয়ে গ্রামের অনেকে ভারতে পালিয়ে যায়। তাঁর সামনে বৃদ্ধ বাবা-মাকে মাথায় ঝুড়িতে করে ভারতে নিয়ে যায় হিন্দুরা। গ্রামে ভয়ে অনেকেই রান্না করা ভাত ফেলে পালিয়ে গেছে। মফিজউদ্দিন মোল্লা ও সিরাজ মোল্লা নামের দুই ভাইকে হত্যা করে 'কোকোর' দল। এছাড়া তাঁর ফুফাতো ভাইকে, বাবার বাড়ির লুৎফর নামের কৃষককে, অ্যাজ মণ্ডল ও আহাদকেও মেরে ফেলা হয়।

মান্নান মৌলভি বলেন, "শান্তি কমিটির সদস্য তোরাব জোয়ারদারকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তার ছেলেকে গ্রাম্য কোন্দলে হত্যা করা হয়।"

সুফিয়া বেগম জানান, "রাজাকার খুব জ্বালাত। বাড়ি থেকে উঠিয়ে নিতে গেলে লোকেরা বাধা দিয়েছে। তখন বাড়ির মুরুব্বিদের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। গুলি বা ধরে নিয়ে যাওয়ার ভয়ে সন্তানদের তারা বাইরে যেতে দিত না।"

নোয়াখালীর ঘোষবাগ গ্রামের আবদুর রশিদ (সাবেক মেম্বার) জানান, যুদ্ধের সময় হিন্দুর বাড়িতে আগুন দিলে সেখানে এক বৃদ্ধা পুড়ে মারা যান।

পান্টির তখনকার আওয়ামী লীগ নেতা জলিল মোল্লার ভাষ্য মতে, একবার আর্মি নগরকয়াতে এসে শফি বিশ্বাস, আফসার মাস্টার ও খোকা মিয়ার বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। এ সময়ে আর্মি সঙ্গে নিয়ে রাজাকাররা বাড়ি বাড়ি যায় মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে বের করার জন্য। আর্মি যুবকদের পেলেই গুলি করছে—এ রকম শোনা যাচ্ছিল। খোকা মিয়ার বাড়িতে আগুন দেওয়া দেখে নঈমুদ্দিন শেখ পালাতে গিয়ে, আবার কী মনে করে খড়ের গাদা থেকে খড় নিয়ে গরুর সামনে দিতে গেলে আর্মি তাঁকে ধরে ফেলে। ধরেই মারতে থাকে। থুতনিতে জোরে আঘাত করে ফেলে দিয়ে তাঁকে গুলি করতে যায়। পরে তাঁর মায়ের কান্নাকাটিতে ছেড়ে দেয়। এ ছাড়া গ্রামের তালেব, হাকো পাগলকে প্রচণ্ডভাবে মারে।

দৌলতপুরের সিলিমপুর গ্রামের আমেনা খাতুন জানান, গ্রামের দুই পাশ থেকে গোলাগুলি হয়েছিল। তখন তাঁর ছেলে রেজাউল গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। পরে তাঁর ভাই স্ট্রোক করে মারা যায়। তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

CamScanner

সাঁওতার কুতুবউদ্দিন বিশ্বাস জানান, এক অবাঙালি কুষ্টিয়ার ঢেঁকিপাড়ার এক মেয়েকে বিয়ে করেছিল (যুদ্ধের আগেই)। ইপিআর যুদ্ধের পরে যখন কুষ্টিয়া দখল করল তখন এই অবাঙালি শ্বশুরবাড়িতে এসে ওঠে। কিন্তু দু-এক দিন পরেই ইপিআর জেনে যায় এবং ওই বাড়িতে হামলা করে। মাঠে পালিয়ে যাওয়ার সময় অবাঙালিকে ওরা ধরে ফেলে। ধরে নিয়ে কালী নদীর ওপারে যায়। নিশ্চিত মৃত্যু জেনে সে ওদের কাছে দুই রাকাত নামাজের অনুমতি চায়। ওরা সময় দিলে সে নদীর পানিতে অজু করে ওখানেই নামাজ পড়ে। তারপর তাকে পেছন থেকে গুলি করে মারে।

পাহাড়পুরের (কুষ্টিয়া থেকে তিন কিলোমিটার দূরত্ব) জোতদার আবদুল কাদের শেখের স্ত্রী হায়াতুন্নেছা জানান, কুষ্টিয়াতে প্রতিরোধযুদ্ধের পরে আর্মি পুনর্দখল করে শহর ও আশপাশের গ্রামগুলোতে ব্যাপক অত্যাচার করতে থাকে। তিনি বলেন, "এ সময়ে বিভিন্ন দিকে আগুন দেখে আমার শাশুড়ি ও ছেলের বাবা ছাড়া পরিবারের সবাইকে (তিন ছেলে, চার মেয়ে, খালাশাশুড়ি, তার চার ছেলেমেয়ে) মনোহরপুর তাঐ (তালুই) বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মহিষের গাড়িতে বিভিন্ন মালপত্র নিয়ে শুধু আমি বসে ছিলাম, আর সবাই হেঁটে আসে।"

চর ভদ্রাসনের আমির খার ডাঙ্গি গ্রামের মো. জহির উদ্দিন খান বলেন, "আর্মি আসার পর গ্রামে নিরাপদে চলাফেরা করা যেত না। গ্রামে ১০০-১৫০ ঘর হিন্দু ছিল। যুদ্ধ শুরুর পর আর্মি বদ্দির ডাঙ্গি পোড়ালে অনেক হিন্দু ভারতে চলে যায়।"

কুষ্টিয়ার রামনগরের বিমল কৃষ্ণ পোদ্দার জানান, যুদ্ধের প্রথমেই ছোটভাই শ্যামলের মাধ্যমে বাড়ির মেয়েদের ভারতের আসাননগরে ভগ্নীপতি ডা. সুধীর বিশ্বাসের বাড়িতে পাঠানো হয়। সেপ্টেম্বর মাসে বাবা-মা ছাড়া তারা বাকি সবাই কাদিরপুর বর্ডার পার হয়ে ভগ্নীপতির বাড়িতে গিয়ে ওঠেন।

আবুল শাহ: জবানবন্দি

আবুল শাহ জানান, আর্মি আসছে শুনে কিছু লোক নদীর 'চাঙড়া' (বাঁশের তৈরি সাঁকো) তুলে ফেলে। আর্মি পানির মধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে কীভাবে পার হয় তা দেখার জন্য আবুল শাহ এক দোকানের তেলের ড্রামের আড়ালে লুকিয়ে থাকেন। কিন্তু প্রথমে পার হয়ে আসা একজন আর্মি তাকে ধরে লাথি ও চর মারতে থাকে। এভাবে তাঁকে ক্যাম্পে নিয়ে আসে। বাজারে তখন কোনো লোক ছিল না। তাঁকে বারবার জিজ্ঞাসা করে সাঁকো কারা তুলেছে। কিন্তু তিনি আসলেই জানতেন না। পরে আর্মি তাঁকে ছেড়ে দেয়।

CamScanner

আবুল শাহ আরো জানান, বিভিন্ন বাড়ি থেকে চট ও কাঁথা সংগ্রহ করে দিতে হয়। ঝাঁটা নিয়ে এসে ঝাড়ু দিতে হয়। এক আর্মি এসে তাঁর বাড়ি দেখে যায় ও পরদিন সকাল থেকে নিয়মিত তাঁকে আর্মি ক্যাম্পে যেতে বাধ্য করে। তার কাজ ছিল ভোরে গিয়ে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করা, মাঝে মাঝে পানি তুলে দেওয়া, খাবার বেড়ে দেওয়ার পর প্লেটগুলো পৌঁছে দেওয়া, ছোটখাটো জিনিসপত্র কিনে দেওয়া, কারও জন্য গোপনে সিগারেট নিয়ে আসা ইত্যাদি। তারা এক মাস ছিল।

আবুল শাহের ভাষায়, "এরা যে কয়দিন ছিল আমারে ও-রে (ওদের) পায়রাবি করতি হইছিল।" তবে আর্মি যাওয়ার সময় বেঁচে থাকা আটা ও চিনি তাঁকে দিয়ে যায়।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী

হাজারী মণ্ডল জানান, আর্মি আসছে শুনে সবাই পালিয়ে গেলে তিনিও পালিয়ে রামনগর বটতলায় আসেন। কিছু সময়ের মধ্যেই দু দিক থেকে আর্মি আসতে থাকে। আর্মি তাঁকে দেখে প্রথমেই মারতে শুরু করে। তারপর একজন তাঁকে পানি নিয়ে আসতে বলে। তিনি গ্রামের মধ্যে গিয়ে দেখেন গ্রামে কেউ নেই। তখন জীবনের মায়া ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে না গিয়ে কুয়ো থেকে পানি এনে তাদের দেন। পানি খেয়ে তারা এক বস্তা আটা তার মাথায় তুলে দেয়। বড় বস্তা, খুব কষ্ট হয় নিয়ে যেতে। একটু দাঁড়াতে গেলেই রুলের বাড়ি খেতে হয়। এভাবে প্রায় এক মাইল যাওয়ার পরে মূল রাস্তায় ওঠে তারা তাকে ছেড়ে দেয়। তাঁকে একটা রুটি দিয়ে কোনো দিক না তাকিয়ে সোজা চলে যেতে বলে।

দৌলতপুরের বাহার আলী মিস্ত্রি জানান, এলাকার রাজাকার হাশেমের শরীর কেটে লবণ দিয়েছিল মুক্তিযোদ্ধারা। তার বাবাকেও গুলি করে মাটিতে পুঁতে ফেলে মুক্তিযোদ্ধারা। তাঁদের গ্রামের সমেত চৌকিদারকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ধরে নিয়ে যায়।

নোয়াখালীর আমেনা খাতুন জানান, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গুলিতে গুরুতর আহত ব্যক্তিদের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন তারা। সেনাবাহিনী ফিরে আসার খবর শুনে আহতদের রাস্তায় ফেলে রেখে পালান তাঁরা। পরে সেখানেই আহতরা মারা যান। তাঁর শ্বশুর ও ভাসুরসহ অনেককে মেরে ফেলে সেনাবাহিনী। শ্বশুর ও ভাসুরের লাশ রেখে পালিয়েছিলেন তিনি। একদিন পরে এসে তাঁদের দাফন করেন। অন্যরা সেই সুযোগও পাননি।

মর্জিনা খাতুন বলেন, "গ্রামে বিহারি পরিবার ছিল। তাঁদের এক পরিবারের দুই ভাই রেলওয়েতে চাকরি করতেন। তাঁদের কে জানি মেরে ফেলে। গ্রামে হিন্দুদের অনেককে মেরে ফেলে আর্মি। পরে অনেকেই ভারতে চলে যায়।"

CamScanner

রামনগরের বিমল কৃষ্ণ পোদ্দার বলেন, "আর্মি আসার কথা শুনলে আমরা পাশের শৈলকুপা থানার বিত্তিপাড়া বা ধর্মপাড়াতে পালাতাম। জুন মাসের দিকে যখন আমাদের বাড়ি পোড়ায় তখন বাড়িতে শুধু বাবা ছিল। আর্মি রাইফেল দিয়ে বাবাকে আঘাত করে, ফলে তিনি অজ্ঞান হন।"

পদনাথ সরকারের জবানবন্দি

মহেন্দ্রপুরের পদনাথ সরকার জানান, পাকিস্তানের সেনাবাহিনী দিবক সর্দারকে জবাই করে ও সিদ্ধি হালদারকে গুলি করে। কিছুসংখ্যক হিন্দু দয়ারামপুরসহ আশপাশের গ্রামে অভিযানের কথা জেনে আয়েন উদ্দিন শেখের কাছে কয়েক টিন ঘি রাখে। কিন্তু রাজাকারদের মাধ্যমে খবর পেয়ে আর্মি অভিযানে এসে আয়েন উদ্দিনকে ঘরে পুড়িয়ে মারে। এক পাড়াতে আর্মি প্রবেশের কারণে অন্য পাড়ায় ভগবান সরকারের ফাঁকা বাড়িতে কয়েকজন মহিলাসহ কিছু লোক আশ্রয় নেয়। এ সংবাদ পেয়ে আর্মি এসে বাড়িতে তালা লাগিয়ে আগুন দেয়। তবে আর্মি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজি অখিল উদ্দিন ওরফে ওহিরুদ্দিন হাজি আখক্ষেতের আড়াল থেকে এসে বেড়া কেটে সবাইকে উদ্ধার করেন।

মহেন্দ্রপুরের পদনাথ বলেন, "আমার মেজভাই ঘরে কী একটা জিনিস রয়েছে বলে এক দৌড়ে আনতে যায়। কিন্তু ঘরের চৌকাঠে পা দিতেই আর্মি ঢুকে পড়ে ও তাকে মারতে থাকে। ভাইয়ের বৌ ও বাড়ির মেয়েরা কাঁদতে থাকলে মুখ চেপে বন্ধ করি। কিন্তু আমার মাকে কোনোভাবেই আটকে রাখা যাচ্ছিল না। চোখের সামনে ছেলেকে পিঠমোড়া করে বেঁধে মারতে মারতে গরুর মতো নিয়ে যাচ্ছে। শুধু ভাই না, পাশের ঘরের তারাপদসহ আরো কয়েকজনকে এভাবে নিয়ে যাচ্ছে।"

পদনাথ আরও বলেন, "আমরা নিশ্চিত যে ভাইকে কিছুক্ষণের মধ্যেই মেরে ফেলবে। কিন্তু কোনো একজন রাজাকার সংবাদ দেয় যে, আর্মি অভিযানের কথা শুনেই পিনু শেখের গরু চরভবানীপুর বাথানে রাখা হয়েছে। তখন আমার ভাই আর তারাপদকে বাঁধন খুলে গরু নিয়ে আসতে বলে। মুক্ত হয়ে দুজন প্রথমে চরে গিয়ে পরে নদী পার হয়ে আমাদের বাড়িতে সংবাদ দেয়। আমরা জীবন বাঁচাতে সে রাতেই ভারতের উদ্দেশে রওনা দিই। সাঁওতা ও কাঞ্চনপুর গ্রামে পাকিস্তানের সমর্থনকারী ছিল। এখানে একবার অবাঙালি ও রাজাকাররা অভিযানে আসে। গ্রামের সব লোকই পাশের ডোবা, ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গলে পালাতে থাকে। পরে অবশ্য গ্রামের রাজাকাররা আর্মিকে বোঝাতে সক্ষম হয় ও তারা চলে যায়।"

CamScanner

নির্যাতনের কারণে হিন্দুদের দেশত্যাগ

কামাক্ষ্যা অধিকারী জানান, ইপিআর যুদ্ধের কিছুদিন পরে আর্মি কুষ্টিয়ার গ্রামগুলোকেও নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। তারা বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প স্থাপন করে। এমনি একটা ক্যাম্প ছিল শহরের ২১ কিলোমিটার পূর্বে পান্টিতে। এখান থেকে তারা পান্টি ও আশপাশের গ্রামে অভিযান চালাতে থাকে। তাদের সঙ্গে একদল স্থানীয় লুটেরাও থাকত। আর্মি এক বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়িতে গেলে ছেড়ে যাওয়া বাড়িতে লুট চলত। পান্টির পাশের শ্রীপুর গ্রামে অভিযানের পর হিন্দুদের মুরুব্বি (মাতব্বর ধরনের) গিরীন ডাক্তার, বাসুদেব বিশ্বাস ভারত চলে যান। ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই গ্রামের সব হিন্দু ভারতে চলে যান।

রামনগরের ফণীন্দ্রনাথের আত্মীয়রা তাকে খোকসাতে তাদের ওপর অত্যাচারের কথা জানান। ভারত যাওয়ার পথে তাঁরা ১০-১২ জন তাঁর বাড়িতে রাত কাটান। ফণী দাস তাদের সঙ্গে দেশত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। কয়েক দিন পরে আর্মি বাগবাড়িয়াতে অভিযান করে হিন্দুবাড়ি জ্বালিয়ে দেয় ও জিতেনকে হত্যা করে। সে রাতেই ফণী দাস ও তাঁর ভাই সপরিবারে (১৬ জন) ভারত রওনা দেন। একই ঘটনাতে বাগবাড়িয়া, পান্টি ও রামনগরের অধিকাংশ হিন্দু ভারত চলে যান।

গ্রামে যুদ্ধ

দৌলতপুরের শেরপুর গ্রামের রওশনারা জানান, তাঁর গ্রামে যেদিন যুদ্ধ হয় সেদিন পাশের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর স্বামীর লাশ দেখতে পারেননি। মৃত্যুর দুই-তিন দিন পর তাঁকে দাফন করা হয়েছিল। তাঁর বাবার লাশ আনতে গেলে গ্রামের মানুষরা নিষেধ করেন। তাই তিনি যাননি।

আগুন দেওয়া

চর ভদ্রাসনের খবিরুদ্দিন আহমেদ জানান, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হিন্দুদের উচ্ছেদ করতে এসে হিন্দুপাড়া দেখে গুলি করে ও ঘরে আগুন দিতে দিতে হাজীগঞ্জ এসে পৌঁছায়। হাজীগঞ্জ আসার পথে বদ্দিরডাঙ্গির অনেক মানুষকে তারা মেরে ফেলে। রতন চেয়ারম্যানের বাবা আওয়ামী লীগ করতেন বলে পাকিস্তানিরা ধরে নিয়ে যায়। তাঁকে আর পাওয়া যায়নি। তাঁর গ্রামের খেতন বিশ্বাস ও টেনা মুন্সি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।

ঘোষবাগ গ্রামের কৃষক সুবোধ চন্দ্র বলেন, "সাহা গ্রামে এক বাড়িতে রাজাকাররা আগুন দেয়।" একই কথা জানান কবিরহাটের ধীরাজ রঞ্জন ভৌমিক।

CamScanner

হত্যা

চর ভদ্রাসনের চর সুলতানপুর গ্রামের আদেল উদ্দিন ফকির জানান, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিতে তাঁর এলাকায় ছয়জন হিন্দু মারা যান। তবে তাঁদের পরিবারের কেউ মারা যায়নি।

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার ভাঁড়রা গ্রামে ১ জ্যৈষ্ঠ পাকিস্তান সেনাবাহিনী চারজনকে গুলি করে হত্যা করে। বাগবাড়িয়াতে জিতেনকে হত্যা করে। ১৬ এপ্রিলের পরবর্তী কয়েক দিন কুষ্টিয়ার পাশের গ্রাম ছেউড়িয়াতে ওমর আলী, মোহাম্মদ আলী, কিনু, সামসুদ্দিন আহমেদকে হত্যা করে।

২২ জুলাই কয়াতে আলিম উদ্দিন মোল্লা ও তাঁর দুই ছেলে ইব্রাহীম ও হানিফ মোল্লাকে পুড়িয়ে হত্যা করে। সেপ্টেম্বরে (দ্বারিক গ্রামে) শিলাইদহ অভিযানে কানাই, মোংলা, ভোলা, শ্রীপদ, খলিশা, হুজুর আলী (দোকানদার); মাজগ্রামের কিতাই ও খোর্দ্দবন গ্রামের আদালতকে হত্যা করে। আশ্বিন মাসে মহেন্দ্রপুর অভিযানে চরভবানীপুর, জোতপাড়া, হোগলা ও মহেন্দ্রপুর থেকে ১১ জন গ্রামবাসীকে ধরে দারোগার আমবাগানে নিয়ে জবাই করে হত্যা করে। দয়ারামপুর অভিযানে দিবক সর্দার, সুধীর ঘোষ, হালদারদের জামাই ও আরো ছয়জনকে গুলি করে হত্যা করে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের আমীর মণ্ডলের ঘরবাড়ি পাকিস্তানের সেনাবাহিনী পুড়িয়ে দিয়েছিল বলে জানান তিনি।

শ্রী সদানন্দ বৈরাগী বলেন, "ওরা (পাকসৈন্যরা) সাথে সাথে বেয়নেট দিয়ে প্যাট ফাইড়ে নদীতে ফেলায়ে দেত। খানেরা মাইরে গেলে গ্রামের লোকজন লাশ এখান থেকে ওখান থেকে কুড়োইয়ে মাঠের মধ্যি গর্ত কইরে পুইতে রাখত। আর নদীর সাইড দিয়ে যেগুলো, সেগুলো ভাসায়ে দেত।"

কালিয়া থানায় জুলাই-আগস্টের আগে স্থায়ীভাবে আর্মি আসেনি। মাঝে মাঝে খুলনা থেকে গানবোটে করে আর্মি আসত। মে-জুন মাসে হিন্দুরা অধিক হারে ভারত যেতে শুরু করে। এর পরই জুলাইয়ের দিকে কালিয়াতে স্থায়ী ক্যাম্প করে মিলিশিয়ারা। মূলত হিন্দু গ্রামগুলোর ওপর অত্যাচার, নির্যাতন, লুট ও অগ্নিসংযোগ শুরু হলে হিন্দুরা বেশি হারে ভারতমুখী হয়। ঘোষপাড়া ও বড় কালিয়ার হিন্দুরা ভারত যায়নি।

পান্টি বাজার পোড়ানো: জলিল মোল্লার বয়ান

পান্টি বাজার পোড়ানো সম্পর্কে তখনকার আওয়ামী নেতা আবদুল জলিল মোল্লা বলেন, "কয়েক দিন থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে পরিস্থিতি খুবই খারাপের দিকে

যাচ্ছে। আশপাশের ইউনিয়নের রাজাকার ক্যাম্পগুলোর পতনের পর মুক্তিযোদ্ধারা পান্টি রাজাকার ক্যাম্পকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ কিংবা আক্রমণের হুমকি দেয়। এতে খিলাফাত চেয়ারম্যান পালিয়ে কুষ্টিয়া গিয়ে থাকে ও বেশ কয়েক দিন তার খোঁজ পাওয়া যায় না। সবাই ধরে নেয় যে, এবারে বেশ বড় রকমের প্রতিশোধ সে নেবে। পরে সে কুষ্টিয়াতে 'আফিল হাউজে' (খিলাফাত চেয়ারম্যানের ভাই, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পরাজিত মুসলিম লীগ প্রার্থী শিল্পপতি আফিল উদ্দিনের কুষ্টিয়ার বাসভবন 'আফিল হাউজ') অবস্থান নেয় এবং আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ করে পান্টি অভিযানের জন্য প্ররোচনা দেয়।"

জলিল মোল্লা জানান, তিনি নিজের পরিবারকে তিন কিলোমিটার দূরে তাঁর মামাবাড়ি ভালুকাতে পাঠিয়ে দেন। বাড়িতে শুধু বৃদ্ধা মা, বড় ও মেজ ভাই, চাচাত ভাইয়ের ছেলে ছিল। আর্মি আসতে দেখে তিনি বাড়ির পেছন দিয়ে পালিয়ে পশ্চিমে মাঠের মধ্যে যান। ততক্ষণে সৈন্যরা পশ্চিম থেকে পূর্বে মূল গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আগুনের ধোঁয়া, গুলি আর চিৎকার শোনা যাচ্ছে। নজরুল দোকানদারের তেলের ব্যারেল ওপরে উঠে প্রচণ্ড শব্দে ফেটে যাচ্ছে।

জলিল মোল্লা বলেন, "এসব দেখে আমি ভাবছিলাম যে, নজরুলের দোকানের একটু পরেই বাজারের শেষ, আর আমাদের বাড়ির বাগান শুরু। সুতরাং আমাদের বাড়িও নিশ্চয় জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমি সবে মাঠ থেকে রাস্তার ওপরে উঠেছি, ভাজন জোয়াদ্দার (মজির উদ্দিন জোয়াদ্দার) তাড়াতাড়ি করে আমার কাছে এসে বলল, 'কোনো খবর জানো?' আমি বললাম, 'মনে হয় আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে।' সে বলল, 'বাড়িতে আগুন দিয়েছিল, কয়েকজন রাজাকার আবার নিভিয়ে দিয়েছে। তোমাকে না পেয়ে তোমার ভাই সোবহান আর ভাতিজা আজগরকে ধরে নিয়ে গেছে।' আমার মাথায় কোনো কিছু আসছিল না। শুধু মনে হচ্ছিল আমার জন্য আমার ভাই আর ভাতিজাকে মেরে ফেলবে।"

জলিল মোল্লা জানান, অপর গ্রুপটি বাড়ি থেকে বের হতে দেরি হওয়ায় অন্য পথে পেছন দিক দিয়ে রামদিয়া হয়ে নদী পার হতে গিয়ে দেখে, দূর থেকে সারিবদ্ধভাবে আর্মি পান্টিতে আসছে। শুধু তারাই নয়, আরো যেসব লোক জীবন বাঁচাতে পালাচ্ছিল তারাও নদীর মধ্যে নেমে পড়ে। তারা ডুবে ডুবে নদী পার হয়। কিছু সময় পরে অপর আত্মীয় মোজাম্মেল হক জোয়াদ্দারের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। আর্মি চলে যাওয়ার অনেক পরে সন্ধ্যায় সবাই বাড়ি ফিরে আসে।

নঈমুদ্দিন শেখের স্ত্রী বলেন, "পান্টি বাজার পোড়ানোর দিন সকালে কেবল ভাত রান্না হয়েছে, এ সময়ে সবাই পালাতে থাকে। আমার প্রথম সন্তান রেজাউল ১১ দিনের কোলে। সত্যি বলতে, আমি তখনও বাচ্চা কোলে নেওয়া শিখিনি। তাই

CamScanner

যেভাবেই কোলে নেই না কেন, বারবার বাচ্চা পড়ে যেতে চায়। শেষে পাশের বাড়ির গোবিনের মা তার ১০ মাসের বাচ্চাটা আমার হাতে দেয়, আর আমারটা ও নেয়। সবাই মিলে সিসেলের মাঠে পাট ও আখের ক্ষেতের মধ্যে পালাই। ছেলের বাবা সব সময় সঙ্গে ছিল। পরে শুনাশুনি করে আসরের পরে বাড়ি ফিরে আসি।"

রাজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্যরা

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের জসিম উদ্দিন জানান, এলাকার চৌকিদার সরমদ মণ্ডলের ছেলে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তাই তাঁকে রাজাকাররা মেরে ফেলে।

বিমল দাশ জানান, তাঁদের এলাকায় হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হয়নি। শান্তি কমিটির সদস্য মফিউদ্দীন মুন্সী হিন্দুদের রক্ষা করেছেন। তাঁদের গ্রামে হারিন ও গণি নামে রাজাকার ছিল।

দৌলতপুরের শেরপুর গ্রামের রওশনারা জানান, তাঁরা অনেক সময় ভাতের মাড় খেয়ে থাকতেন। সেনাবাহিনীর ভয়ে গ্রাম পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাঁর বাবার গ্রামে সুলাইমান নামের এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। ভেড়ামারা থেকে পালিয়ে আসা অনেকেই তাঁদের বাড়িতে দুই-তিন মাস ছিল। রাজাকারদের ভয়ে ছোট চারজন সন্তান নিয়ে তিনি মাঝে মাঝেই পালিয়ে থাকতেন। তাঁদের গ্রামে যুদ্ধের দিন আশপাশের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

কুষ্টিয়ার পান্টি গ্রামের শ্রী নরেন্দ্রনাথ কর্মকার জানান, বিলবরইচারাতে রাজাকার ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যকার যুদ্ধে রাজাকার কমান্ডার কুতুব নিহত হয়। পরে কুতুবের বোনকে মুক্তিযোদ্ধারা নিয়ে এসে ভদ্দরপাড়াতে নোমানের বাড়িতে রাখে। নোমান জোর করে মেয়েটাকে বিয়ে করে, তখন নোমানের বয়স ৯০-এর উপরে।

অন্যরা

দৌলতপুরের সিলিমপুর গ্রামের আমেনা খাতুন বলেন, "এলাকার অনেকে ভারতে যাওয়ার সময় হিন্দু-মুসলিমরা আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। শরণার্থীরা ভারতে যাওয়ার সময় বন্যার পানি পার হয়ে যেতেন। তাঁদের কেউ আবার মাথায় ডালিতে করে বৃদ্ধ বাবা-মাকে নিয়ে যেতেন।"

পান্টির নঈমুদ্দিন শেখের স্ত্রী বলেন, "আমি দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপতে থাকি। কোনোভাবেই স্থির থাকতে পারছিলাম না। বারবার বলে, 'বৈঠ'। কিন্তু আমি না পারছিলাম বসতে, না দাঁড়াতে, আবার কাঁদতেও ভুলে গিয়েছিলাম। ওরা বারবার

CamScanner

বসতে বললেও আমি না বসায় ওরা বিরক্ত হয়। এ সময়ে আর্মি চলে যেতে থাকলে ওরাও চলে যায়।”

নকশাল

দৌলতপুরের আলমগীর মিয়া বলেন, “শত্রুতার কারণে যুদ্ধের সময় হবিবার বিশ্বাসকে হত্যা করে কমিউনিস্ট লাল বাহিনীর লোকেরা।” নরুজ্জামান আলী জানান, তাঁর গ্রামে মুক্তিযোদ্ধা করিম আবু কাশেমকে নকশালদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য মেরে ফেলা হয়।

CamScanner